অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ

আয়ুর্বেদ মানে যে শাস্ত্রের সাহায্যে আয়ু বা দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। অথর্ববেদের ভৈষজ্য মন্ত্রগুলিই ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রাথমিক রূপ বলে মনে করা যায়। এখানে তক্মন্ (জ্বর) প্রভৃতি নানা রোগের কথা আছে। তবে তাদের দানবরূপে কল্পনা করা হয়েছে। রোগ-নিবারক নানা ভেষজের কথাও এখানে আছে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে লতাগুল্মের ব্যবহারের কথাও এতে আছে। আয়ুর্বেদজ্ঞ রূপে আত্রেয়, কাশ্যপ, হারীত, অগ্নিবেশ, ভেড় প্রভৃতি প্রাচীন মুনি-ঋষির নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে আবার ঋষি আত্রেয়কে আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটকেও চিকিৎসা-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে আত্রেয়ের শিষ্য জীবক শিশুরোগবিশেষজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্বেদ আটটি অঙ্গে বা অংশে বিভক্ত ছিল। তাই একে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বলা হয়। অঙ্গগুলি হল—(১) শল্য (সার্জারি বা অস্ত্রোপচার), (২) শালাক্য (শিরোরোগ), (৩) কায়চিকিৎসা (ভৌতবিদ্যা), (৪) কৌমারভৃত্য (শিশুচিকিৎসা), (৫) অগদতন্ত্র (ঔষধবিদ্যা), (৬) বিষচিকিৎসা, (৭) রসায়ন তন্ত্র ও (৮) বীজকরণ তন্ত্র।

মতান্তরে—(১) শল্যতন্ত্র (Major Surgery), (২) শালাক্যতন্ত্র (Minor Surgery), (৩) কায়চিকিৎসা (Therapeutics), (৪) ভূতবিদ্যা (Demonology), (৫) কৌমারভৃত্য (Paediatrics), (৬) অগদতন্ত্র (Toxicology), (৭) রসায়ন (Elixir), (৮) বাজীকরণ (Approdisiacs)।

উৎস তথা উৎপত্তি—বৈদিক সাহিত্যেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উৎসের সন্ধান মেলে। ঋগ্বেদসংহিতার রুদ্রসূক্তে বলা হয়েছে—

"ত্বাদত্তেভি রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্ দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ।। (২/৩৩/২)

অর্থাৎ—"হে রুদ্র! তোমার দেওয়া সুখকর ওষধি দ্বারা আমরা যেন শতবর্ষ বেঁচে থাকতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, পাপ নির্মূল কর এবং শরীরের সকল রোগ দূর কর।" এছাড়া অথর্ববেদের ভৈষজ্য মন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্র প্রভৃতিতে আয়ুর্বেদের উৎস নিহিত আছে। অবশ্য অথর্ববেদের ঋষিগণ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টিকর্তারূপে বিশেষ বিশেষ অসুরের কল্পনা করেছেন এবং রোগ-নিরাময়ের জন্য মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাকে দূর করতে চেয়েছেন। সুন্দর স্বাস্থ্য ও নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের জন্য আয়ুষ্যমন্ত্রের প্রয়োগ করা হত। বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বৈদিক ঋষিদের অজানা ছিল না। শল্য চিকিৎসার কথাও বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিশ্‌পলার দু'পায়ে লোহার তৈরি

Scanned with CamScanner

জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলেন ("সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্")। বৈদিক যুগে মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা ও বন্ধ্যাত্বকরণের চর্চার কথাও জানা যায়।

লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, পিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করবার আগেই 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে এক লক্ষ শ্লোকে নির্বদ্ধ ও সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে তাঁর সৃষ্ট জীবগণকে অল্পায়ু ও স্বল্পধী দেখে তিনি সেই গ্রন্থটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আটটি অঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য ও দক্ষ প্রজাপতি তাঁর কাছ থেকে সেই আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। পরে দক্ষ প্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং তাদের কাছ থেকে আবার ইন্দ্র এই শাস্ত্র শেখেন।

প্রাচীন সাহিত্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকজন উপদেষ্টা ঋষির নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে মহর্ষি আত্রেয়কেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রবর্তকরূপে গণ্য করা হয়। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছ থেকে কায়চিকিৎসা শিখে নিজ শিষ্যদের তা শিখিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। তিনিই চিকিৎসাশাস্ত্রে আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য চরকসংহিতায় তিনজন আত্রেয়ের নাম আছে—অত্রিপুত্র আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভিক্ষু আত্রেয়। অত্রিপুত্র আত্রেয়ই চরকসংহিতার প্রধান বক্তা। ইনি আবার অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন তন্ত্রকারের গুরু। কৃষ্ণাত্রেয় ছিলেন শালাক্যতন্ত্রের গ্রন্থকার। চরকসংহিতার নানা টীকাকার কৃষ্ণাত্রেয়ের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করেছেন। বৌদ্ধ চিকিৎসক ভিক্ষু আত্রেয় হলেন অত্রিসংহিতার প্রণেতা। তিনি মগধরাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক জীবক তাঁর শিক্ষাতেই শালাক্য ও শিশুরোগ চিকিৎসায় পারদর্শী হন।

সুবিশাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় বলে এর এক একটি অঙ্গ বা তন্ত্রকে অবলম্বন করে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। যথা—আত্রেয় সম্প্রদায়, ধন্বন্তরি সম্প্রদায়, শালাক্য সম্প্রদায়, ভূতবিদ্যাতান্ত্রিক সম্প্রদায়, অগদতান্ত্রিক সম্প্রদায়, রসায়নতান্ত্রিক সম্প্রদায় এবং বাজীকরণতান্ত্রিক সম্প্রদায়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি তন্ত্রের বিষয়বস্তু—

(১) শল্যতন্ত্র—এতে আছে কাঠ, পাথর, লোহা, হাড়, ধুলো প্রভৃতি শরীরে ঢুকে গেলে তা বার করবার উপায়ের বিস্তৃত বিবরণ।

(২) শালাক্যতন্ত্র—এতে বর্ণিত হয়েছে চোখ, কান, মুখ ও নাকের রোগসমূহের নিরাময়ের ব্যবস্থা।

(৩) কায়চিকিৎসাতন্ত্র—এতে বর্ণিত হয়েছে বিবিধ অঙ্গে আশ্রিত ব্যাধির, বিশেষত জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

(৪) ভূতবিদ্যা—এতে আছে গ্রহকবলিত মানুষের চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ; অর্থাৎ গ্রহশান্তি, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি।

(৫) কৌমারভৃত্য—এই তন্ত্রটি শিশুরোগ চিকিৎসার আলোচনায় সমৃদ্ধ।

Scanned with CamScanner

(৬) **অগদতন্ত্র**—এতে বর্ণিত হয়েছে সর্প, কীট, বৃশ্চিক প্রভৃতির বিষের বিবরণ এবং সর্পাদির দংশনজনিত ব্যাধি প্রশমনের উপায়।

(৭) **রসায়নতন্ত্র**—এতে আছে রোগনিবারক ভেষজের বিবরণ এবং আয়ু, মেধা প্রভৃতির বর্ধনের উপায়।

(৮) **বাজীকরণতন্ত্র**—এই তন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বিভিন্ন শুক্রের আপ্যায়ন, উপচয় এবং রিরংসাজননের উপায়।

চরক সংহিতা—এটিই অধুনালভ্য প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। এটি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভের মূল হল আরোগ্য তথা সুস্বাস্থ্য। চরক ছিলেন আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর গ্রন্থে কায়চিকিৎসার প্রাধান্য দেখা যায়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে বুদ্ধদেবের জন্মেরও পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে তক্ষশীলায় বাস করতেন আত্রেয়। তাঁর শিষ্য অগ্নিবেশ চরককে আয়ুর্বেদের জ্ঞান দান করেন। সে যুগে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষীরপাণির নামে তন্ত্র বা চিকিৎসা গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। চরক অগ্নিবেশ তন্ত্রকে নবীকরণ করেন। চরকসংহিতার বর্তমান সংস্করণে আছে আটটি বিভাগ ও ত্রিশটি অধ্যায়। তার সঙ্গে আবার কাশ্মীরের অধিবাসী কপিলবলের পুত্র দৃঢ়বল ৪১টি অধ্যায় যোগ করেছেন। বিভাগগুলি হল —

(১) সূত্রস্থান—খনিজ, উদ্ভিজ্জ (বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি) ও প্রাণিজ (জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ) ভেদে দ্রব্য-বিশ্লেষণ। খনিজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যসমূহের রোগ-নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ, তাদের মিশ্রণের ফল এবং নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে। প্রাণিজ বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি, বিভিন্ন জীবের প্রকৃতি, অবস্থান, অন্যান্য প্রাণীর শরীরে প্রবেশ এবং জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় তাদের বিক্রিয়াও এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে।

(২) নিদানস্থান—এই বিভাগে আছে বিভিন্ন রোগের মুখ্য ও গৌণ কারণ, সংক্রমণ, প্রসার, পরিবর্তন প্রভৃতির বিশদ বিবরণ।

(৩) বিমানস্থান—এই বিভাগে আছে মানবদেহ ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা। ভৌতিক দেহের উপাদান ; মনের স্বরূপ ; পরিবেশ, প্রকৃতি প্রভৃতির উপর দেহ ও মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনাও এখানে আছে।

(৪) শারীরস্থান—এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য (Anatomy and Physiology)।

(৫) ইন্দ্রিয়স্থান—এখানে আলোচিত হয়েছে মানবদেহ ও মনের লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যতের আধি-ব্যাধি সম্পর্কে আশঙ্কা ও তার ফল।

(৬) চিকিৎসাস্থান—এই বিভাগে আছে মানবদেহের নানা রোগ ও তাদের উপশম, ভৈষজ্য-চিকিৎসার উপাদান, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, ভৈষজ্য ও ধাতব উপাদানের মিশ্রণ ইত্যাদির বিবরণ।

Scanned with CamScanner

(৭) এবং (৮) কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান—এই দুই বিভাগে চিকিৎসকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে আনুপূর্বিক বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এই গ্রন্থে অপস্মার প্রভৃতি নানাপ্রকার বাতুলতা এবং মহামারীর কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা আছে। পতঞ্জলি চরকসংহিতার ভাষ্য (ব্যাখ্যা) রচনা করেন। গল্প আছে যে, চরক কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। তাই অধ্যাপক লেভির মতে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লোক।

আত্রেয়, অগ্নিবেশ ও চরক কর্তৃক সঙ্কলিত চরকসংহিতা প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ব, দর্শন, রোগ এবং আরোগ্যের বিষয়ে রচিত একটি সম্পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য গ্রন্থ। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থের আরবি ও ফারসি অনুবাদ হয়। চরকসংহিতায় চিকিৎসকদের অনুসরণীয় নৈতিক আদর্শের যে মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে তা সর্বদেশে সর্বকালে সশ্রদ্ধভাবে পালনীয়।

চরক সংহিতার অনেক টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে হরিচন্দ্র, চক্রপাণি দত্ত এবং শিবদাসের টীকা প্রসিদ্ধ।

সুশ্রুত সংহিতা—সুশ্রুতও ছিলেন সুবিখ্যাত চিকিৎসক। মহাভারতে তাঁকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতকে তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়। একাদশ শতকে চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুত সংহিতার টীকা রচনা করেন। জৈঘাট, গয়াদাস ও ডল্লনের ভাষ্য বা টীকাও প্রসিদ্ধ। সুশ্রুতের মতে কেবল রোগনিরাময় নয়, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও ঔষধের প্রয়োজন আছে। বলা হয় যে, সুশ্রুত ছিলেন ধন্বন্তরীর শিষ্য। ধন্বন্তরীর শিষ্যরূপে পরিচিত গার্গ্য ও গালব ছিলেন পাণিনির পূর্ববর্তী। তাহলে সুশ্রুত বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী বলে মনে হয়। অনেকের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে সুশ্রুতসংহিতা সঙ্কলিত হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক নাগার্জুন প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতার সংস্কার সাধন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

প্রাচীন ভারতে ধন্বন্তরি-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের শল্যচিকিৎসা-পদ্ধতির প্রামাণ্য সঙ্কলন সুশ্রুত সংহিতা। নাগার্জুন কর্তৃক পরিমার্জিত ও সংশোধিত সঙ্কলনটিই বর্তমানে প্রচলিত। এর ছটি অধ্যায় হল ঃ—(১) সূত্রস্থান (শল্যচিকিৎসা-বিষয়ক বিশেষ শব্দসমূহের অর্থ), (২) নিদানস্থান (রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ণয়), (৩) শারীরস্থান (মানবদেহের বিবরণ ও ভ্রূণতত্ত্ব), (৪) চিকিৎসাস্থান (বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি), (৫) কল্পস্থান (নানারকম বিষ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ও চিকিৎসার বিবরণ) এবং (৬) উত্তরতন্ত্র (পরবর্তীকালে সংযোজিত এই অংশে আছে বিবিধ বিষয়)।

সুশ্রুতের মতে শল্য-প্রক্রিয়া সাত প্রকার—(১) ছেদন (amputation), (২) ভেদন (excision), (৩) লেখন (scrapping), (৪) ত্র্যান (proling), (৫) আহরণ (extracting), (৬) বিস্রবণ (drainage) এবং (৭) সীবন (skin grafting)। আত্রেয়, হারীত ও সুশ্রুতের নামে প্রচলিত বৃষ্যযোগ (prescription of tonic) বিষয়ে রচিত 'নাবনীতক' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুশ্রুতের অনেক টীকা ছিল। তার মধ্যে চক্রপাণি দত্তের ভানুমতী নামক টীকাটি আংশিক পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

শব-ব্যবচ্ছেদ করে অঙ্গবিনিশ্চয়ের উপদেশ, ব্যবচ্ছেদকার্যে শল্যচিকিৎসকের কর্তব্য, অস্ত্রোপচারের পূর্বের, মধ্যবর্তীকালের ও পরবর্তী সময়ের ব্যবস্থা, অর্শ, অস্থিভঙ্গ, অশ্মরী প্রভৃতির অস্ত্রোপচার, মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা, একস্থানের মাংস নিয়ে শরীরের অন্যস্থানে জোড়া লাগান প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। এ থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, সুশ্রুতের কালে শল্যচিকিৎসা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। উত্তরতন্ত্রে আছে মূলত তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন শাস্ত্রের সংকলন। ভাষার সহজবোধ্যতা, বিষয়ের উপস্থাপন পদ্ধতি গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। গ্রন্থটি চিকিৎসকগণের দ্বারা খুবই সমাদৃত হয়েছিল। গ্রন্থটির টীকাকারগণের মধ্যে জেজ্জট, শ্রীমাধব, চক্রপাণি, ডল্বণ, কৌপালিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাগ্‌ভট (অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ, অষ্টাঙ্গ হৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়)—চরক ও সুশ্রুতের পরই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত বাগ্‌ভট। আত্রেয় সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গ হৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয় নামক তিনটি আয়ুর্বেদবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর পিতার নাম সিংহগুপ্ত। তিনি ছিলেন সিন্ধুদেশের অধিবাসী। তাঁর গ্রন্থগুলি দাক্ষিণাত্যে বেশি প্রচলিত ছিল। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবত চরক ও সুশ্রুতের পরে এবং বৌদ্ধযুগের পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং তাঁর দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয় বাগ্‌ভট খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। হারীতসংহিতায় তাঁকে যুধিষ্ঠিরের রাজবৈদ্য বলা হয়েছে। কারো কারো মতে তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতক। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গেরই আলোচনা আছে। অবশ্য বাগ্‌ভট নিজে এটিকে বিশেষভাব কায়চিকিৎসার গ্রন্থ বলেছেন ("সংগৃহীতং বিশেষণ যত্র কায়চিকিৎসিতম্")। গ্রন্থটি ছয়টি স্থানে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। যথা—(১) সূত্রস্থান—এতে সূত্রাকারে আয়ুর্বেদের পালনীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে ; (২) শরীর স্থান—এতে শরীরের ধর্মবিভাগ, শিরা-ধমনী প্রভৃতির বিভাগ ও কার্যকারিতা, মরণজ্ঞাপক রিষ্টলক্ষণ, গর্ভব্যাকরণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ; (৩) নিদানস্থান—এতে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ ; (৪) চিকিৎসাস্থান—এতে নির্দিষ্ট হয়েছে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ও পথ্যাপথ্যব্যবস্থা ; (৫) কল্পস্থান—এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল পঞ্চকর্ম চিকিৎসাবিধি ; (৬) উত্তরস্থান—এই অংশে আছে শিশুরোগের চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, অস্থিভঙ্গাদির চিকিৎসা, বিষচিকিৎসা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—এটি বাগ্‌ভট-প্রণীত দ্বিতীয় ও পূর্ণ পরিণত গ্রন্থ। এতে তিনি চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার সার সংকলন করেছেন। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের তুলনায় এর রচনাশৈলী সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি সূত্র, শরীর, নিদান, চিকিৎসা, কল্প ও উত্তর নামক ছয়টি স্থানে (খণ্ডে) বিভক্ত। প্রতিটি স্থানই উৎকৃষ্ট। বিশেষত সূত্রস্থানটি সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষের নিদর্শন। বলা হয়—"নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে চ বাগ্‌ভটঃ।" এই গ্রন্থে জ্বরাতিসার, শিশুচিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা অনেক সমৃদ্ধ।

Scanned with CamScanner

রসরত্নসমুচ্চয়—এই গ্রন্থে আছে রসায়ন-ঔষধের সেবনবিধির বর্ণনা, বাগ্‌ভটের মতে যথাসময়ে এরূপ ঔষধি-সেবনে সুফল পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে মোট ত্রিশটি অধ্যায় আছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে রাজযক্ষ্মা রোগের এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে অর্শরোগের চিকিৎসার বিশদ বিবরণ আছে।

বাগ্‌ভটের রসার্ণব ও রসহৃদয় নামে দুটি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

মাধবকর (রুগ্‌বিনিশ্চয়)—রুগ্‌বিনিশ্চয় গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষার্ধে রচিত হয়। গ্রন্থটি 'নিদান' নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকার আয়ুর্বেদাচার্য মাধব কর শিলাহ্রদনিবাসী ইন্দু করের পুত্র। তাঁর 'কর' পদবী দেখে অনেকে তাঁকে বাঙালী বলে মনে করেন। তিনি বাগ্‌ভটের পরবর্তী অন্যতম উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদাচার্য। তাঁর মতে রোগের উৎপত্তির পাঁচটি স্তরভেদ আছে—(১) নিদান, (২) পূর্বরূপ, (৩) রূপ, (৪) উপশয় এবং (৫) সম্প্রাপ্তি। যার দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'নিদান'। গ্রন্থটিতে প্রতিটি রোগের পাঁচটি নিদানের কথা বলা হয়েছে। রোগ হবার আগেই তার কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাকে বলে 'পূর্বরূপ'। কোন রোগ হলে যে লক্ষণ দ্বারা রোগটির স্বরূপ নির্দিষ্টরূপে জানা যায়, তাকে বলে 'রূপ'। রোগের উপশম যার দ্বারা ঘটে, তাকে বলে 'উপশয়'। বায়ু-পিত্তাদিদোষ কুপিত হয়ে যেভাবে রোগ উৎপন্ন করে তার আনুপূর্বিক বিবরণকে বলে 'সম্প্রাপ্তি'। এই গ্রন্থে কেবল রোগের কারণ নয়, রোগের অরিষ্ট লক্ষণসমূহ অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লক্ষণগুলিও বর্ণিত হয়েছে।

মাধবকরের অন্য একটি গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা'। এতে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও মাধবের রচিত বলে কূটমুদ্‌গর (খাদ্যাখাদ্য ও পরিপাকবিষয়ক গ্রন্থ), পর্যায়রত্নমালা, আয়ুর্বেদ-রসশাস্ত্র, আয়ুর্বেদপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়। তবে এই মাধব ও মাধবকর একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা, তাতে সন্দেহ আছে।

চক্রপাণিদত্ত (চিকিৎসা-সারসংগ্রহ)—আত্রেয় সম্প্রদায়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদগ্রন্থ চিকিৎসা-সারসংগ্রহ। রচয়িতা চক্রপাণি দত্ত ছিলেন বাঙালী। তাঁর পিতা ছিলেন গৌড়েশ্বর নয়পালের রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক 'নারায়ণ'। সুতরাং চক্রপাণি ছিলেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক। এই মৌলিক গ্রন্থটিতে রোগনির্ণয় ও বিভিন্ন ধাতবদ্রব্যের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া চক্রপাণি দত্ত 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' নামে চরকসংহিতার ও 'ভানুমতী' নামে সুশ্রুতসংহিতার টীকা এবং 'শব্দচন্দ্রিকা' নামে লোধবলীবংশীয় কুলীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের একটি অভিধান ও বিভিন্ন গাছ-গাছড়া ও পারদাদির ধাতুর গুণাগুণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিষয়ক 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ভাবমিশ্র (ভাবপ্রকাশ)—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ভাবমিশ্র 'ভাবপ্রকাশ' নামে একটি অষ্টাঙ্গসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। বাগ্‌ভটের পরে এটিই সম্পূর্ণ অষ্টাঙ্গসংগ্রহ গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, এতে বিগত সহস্রাধিক বছরের মধ্যে আয়ুর্বেদে সংযোজিত নূতন তথ্যগুলিও যথাযথ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে রসোপরস, বিভিন্ন ধাতু, আফিম, সোহারা প্রভৃতি দ্রব্যের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার কথা এবং নানা নতুন রোগের কথাও আলোচিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

লোলিম্বরাজ (বৈদ্যজীবন)—ভাবমিশ্রের পর প্রায় তিনশ বছরে আয়ুর্বেদের কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। ইতিমধ্যে লোলিম্বরাজ 'বৈদ্যজীবন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করলেও তাতে চিকিৎসা ব্যবস্থা অপেক্ষা কাব্যকলারই বেশি আধিক্য দেখা যায়।

বৌদ্ধযুগে আয়ুর্বেদ

অহিংসাবাদী বৌদ্ধদের কাছে রক্তপাত ছিল ধর্মবিরোধী। তাই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবপুষ্ট কয়েকজন আয়ুর্বেদাচার্য শল্যচিকিৎসা বর্জন করে অন্য ধারার চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফলে উদ্ভব হয় রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ের। এই যুগে শল্যচিকিৎসা প্রায় অন্তর্হিত হলেও রসচিকিৎসা বহুধারায় প্রবাহিত হয়ে আয়ুর্বেদ স্বর্ণযুগের সূচনা করে। রসচিকিৎসা বা রসায়নতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল অকাল-বার্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধ, জরা-ব্যাধির বিনাশ, আয়ুবর্ধন, মেধাজনন প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগে দৃঢ়বল কর্তৃক চরকসংহিতা এবং নাগার্জুন কর্তৃক সুশ্রুতসংহিতা প্রতিসংস্কৃত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের উৎকৃষ্ট টীকাগুলিও এই যুগেই রচিত হয়। বাগ্ভটও এই যুগের গ্রন্থকার। ঐতিহাসিক ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, সম্রাট অশোকের নির্দেশে জটিল ও দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধ-পথ্যসহ চিকিৎসকদল বহির্ভারতে প্রেরিত হতেন। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম বিস্তারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে এই যুগে তিব্বত, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আয়ুর্বেদের মূল সূত্রগুলিও প্রচারিত হয়েছিল। এইযুগে অনেক ভারতীয় চিকিৎসক অগদতন্ত্র বা বিষ-চিকিৎসা শিক্ষা দেবার জন্য আরব, পারস্য, তিব্বত, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশে সসম্মানে আহূত হতেন। এই যুগে স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ নিয়ম এবং প্রয়োজনীয় ঔষধসমূহের তালিকা সকলের অবগতির জন্য প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রোথিত হয়েছিল। বৌদ্ধ যুগেই চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা ও মাধবরচিত নিদান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউনানি চিকিৎসা প্রচলনের পথকে সুগম করে তুলেছিল। বৌদ্ধযুগের রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ের দুজন প্রথিতযশা চিকিৎসক ছিলেন নাগার্জুন ও জীবক।

নাগার্জুন (রসরত্নাকর)—বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নাগার্জুন ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের পথিকৃৎ, বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদ, বিখ্যাত বৈয়াকরণ, রাসায়নিক, লৌহশাস্ত্র বিশারদ এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের শল্য ও শালাক্যতন্ত্রের সংস্কর্তা। তাঁর বিরচিত আয়ুর্বেদ-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—রসরত্নাকর, লৌহশাস্ত্র, আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল, রসকক্ষপুট প্রভৃতি। নাগার্জুনবর্তি, কৃমিভদ্রবটী, রসাভ্রবটি, অভ্রবটিকা, ভক্তবটিকা, মৃতসঞ্জীবনীগুটিকা, বিশ্বেশ্বর-রস, বৃহৎপানীয়, মূলিকাবন্ধন প্রভৃতি বহু আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী জনসাধারণের গোচরে এনে তিনি সমাজের হিতসাধন করেছেন।

চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতায় উদ্ভিজ্জ ঔষধের প্রাধান্য ছিল। নাগার্জুনই আয়ুর্বেদে রসায়নের অর্থাৎ ধাতব ঔষধের প্রবর্তক। তিনিই প্রথম কজ্জলী অর্থাৎ পারদের কালো

সালফাইড যৌগ ঔষধরূপে প্রবর্তন করেন। পারদের অষ্টাদশ সংস্কার ও ধাতুবিদ্যার প্রবর্তন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। রসরত্নাকর গ্রন্থে পারদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি অংশ আছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পারদ একের পর এক ধাতুকে গ্রাস করতে করতে আরো বুভুক্ষিত হয়ে পড়ে। এরূপ গ্রস্তধাতু-পারদ অনেক অসাধ্য রোগ-নিরাময়ে সমর্থ। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁকে পারদবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ঔষধরূপে পারদ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ধাতুর ব্যবহারের কথাও গ্রন্থটিতে আছে।

কেবল পারদ নয়, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, সীসা, স্বর্ণ, হীরক প্রভৃতি ধাতুকে বিভিন্ন ক্ষতরোগে ব্যবহারের যে বিশেষ বিধি বৌদ্ধযুগে আবিষ্কৃত হয়, তার মূলেও নাগার্জুনের বিশেষ অবদান ছিল। এর ফলেই অস্ত্রচিকিৎসার পরিবর্তে কেবল এরূপ বনৌষধির প্রয়োগে ফোঁড়া, বিষফোঁড়া, অর্বুদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি ব্যাধি বিনা অস্ত্রোপচারে নিরাময়ের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। চক্ষুচিকিৎসার জন্য নানাধরনের প্রলেপ, কাজল, শলাকা, বর্তি প্রভৃতির প্রয়োগ বৌদ্ধযুগেই শুরু হয়। তাম্রাঞ্জন, সৌগতাঞ্জন, যুগাবতীবর্তি, তারকাদ্যাবর্তি প্রভৃতি ঔষধগুলি বিনা অস্ত্রে চক্ষুচিকিৎসার উজ্জ্বল নিদর্শন। কর্ণ, নাসিকা, মুখগহ্বর, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রভৃতি স্থানে উদ্ভূত রোগনিরাময়ের পদ্ধতিও বৌদ্ধযুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জীবক (জীবকতন্ত্র)—জীবকের আবির্ভাব বৌদ্ধযুগের আর এক যুগান্তকারী ঘটনা। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহারাজ বিম্বিসারের ঔরসে শীলাবতী দাসীর গর্ভে রাজগৃহে (রাজগীরে) তাঁর জন্ম হয়। তক্ষশীলা থেকে আয়ুর্বেদের সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে বিভিন্ন নগরীতে ব্যাধিপীড়িত বণিকদের অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তিনি প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি উপার্জন করেন। বিম্বিসারের ভগন্দর তাঁর দেওয়া একটি প্রলেপের প্রয়োগেই নির্মূল হয়। সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধসঙ্ঘের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন। তক্ষশীলার শল্যচিকিৎসক ভিক্ষু আত্রেয়ের কাছে জীবক শল্যবিদ্যা শিক্ষা করে শল্যবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শিরঃকপাল উৎপাটন করে অস্ত্রোপচারে (Cranial Surgery-তে) তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জগতের সকল বৃক্ষ, লতা, গুল্মই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতে পারে—একথা তিনি প্রথম ঘোষণা করেন। জীবক ও তাঁর অনুগামী বৈদ্যগণের ভেষজ গবেষণার ফলে বনৌষধিসমূহের জ্ঞান বৈদ্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অভিনব পদ্ধতিতে শিশুরোগ চিকিৎসা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে জীবকের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর রচিত 'জীবকতন্ত্র' নামক গ্রন্থে তিনি শিশুরোগ ও গর্ভিণীরোগের চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন।

আয়ুর্বেদের ক্রমাবনতি

ভারতের যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এককালে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন অর্জন করেছিল, তার ক্রমাবনতি বিস্ময়কর। বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে সমাজের স্থিতিশীলতার হানি, পাঠান

Scanned with CamScanner

ও মোগল রাজত্বকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিসাধনের পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি এরজন্য অনেকটা দায়ী। কেবল বাদশাহ্ আকবর কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। বৃটিশ রাজত্বকালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার আরো অবনতি ঘটে। কেননা, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই শাসকবর্গ সচেষ্ট ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পরে বিভিন্ন স্থানে আয়ুর্বেদশিক্ষার জন্য কয়েকটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সরকারি ঔদাসীন্যে সেগুলির অবস্থা ভালো নয়। একদা আয়ুর্বেদের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গেও আয়ুর্বেদ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। এরই মধ্যে গণনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, যামিনীভূষণ রায় প্রমুখ কবিরাজগণ আয়ুর্বেদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আবার উন্নতিলাভ করবে।

আয়ুর্বেদ, বৈদ্যকশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্র

সংস্কৃত সাহিত্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

আয়ুর্বেদ মানে যে শাস্ত্রের সাহায্যে আয়ু বা জীবন লাভ করা যায়। অথর্ববেদের ভেষজ্য মন্ত্রগুলিই ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রাথমিক রূপ বলে মনে করা যায়। এখানে তক্মন্ (জ্বর) প্রভৃতি নানা রোগের কথা আছে। তবে তাদের দানবরূপে কল্পনা করা হয়েছে। রোগ-নিবারক নানা ভেষজের কথাও এখানে আছে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে লতাগুল্মের ব্যবহারের কথাও এতে আছে। আয়ুর্বেদজ্ঞ রূপে আত্রেয়, কাশ্যপ, হারীত, অগ্নিবেশ, ভেড় প্রভৃতি প্রাচীন মুনি-ঋষির নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে আবার ঋষি আত্রেয়কে আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটকেও চিকিৎসা-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে আত্রেয়ের শিষ্য জীবক শিশুরোগবিশেষজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্বেদ আটটি অঙ্গে বা অংশে বিভক্ত ছিল। তাই একে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বলা হয়। অঙ্গগুলি হল—(১) শল্য (সার্জারি বা অস্ত্রোপচার), (২) শালাক্য (শিরোরোগ), (৩) কায়চিকিৎসা (ভৌতবিদ্যা), (৪) কৌমারভৃত্য (শিশুচিকিৎসা), (৫) অগদতন্ত্র (ঔষধবিদ্যা), (৬) বিষচিকিৎসা, (৭) রসায়ন তন্ত্র ও (৮) বীজকরণ তন্ত্র। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদ গ্রন্থের বিবরণ দেওয়া হল।

চরকসংহিতা—এটিই অধুনালভ্য প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভের মূল হল আরোগ্য তথা সুস্বাস্থ্য। চরক ছিলেন আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর গ্রন্থে কায়চিকিৎসার প্রাধান্য দেখা যায়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে বুদ্ধদেবের জন্মেরও পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে তক্ষশীলায় বাস করতেন আত্রেয়। তাঁর শিষ্য অগ্নিবেশ চরককে আয়ুর্বেদের জ্ঞান দান করেন। সে যুগে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষীরপাণির নামে তন্ত্র বা চিকিৎসা গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। চরক অগ্নিবেশ তন্ত্রকে নবীকরণ করেন। চরকসংহিতার বর্তমান সংস্করণে আছে আটটি বিভাগ ও ত্রিশটি অধ্যায়। তার সঙ্গে আবার কাশ্মীরের অধিবাসী কপিলবলের পুত্র দৃঢ়বল ৪১টি অধ্যায় যোগ করেছেন।

Scanned with CamScanner

বিভাগগুলি হল—(১) সূত্রস্থান (রোগনির্ণয়, পথ্য ও চিকিৎসকের কর্তব্য), (২) নিদানস্থান (প্রধান প্রধান রোগ), (৩) বিমানস্থান (শিক্ষার্থীদের কর্তব্য), (৪) শারীরস্থান (শারীরবিদ্যা ও ভ্রূণবিদ্যা), (৫) ইন্দ্রিয়স্থান (রোগলক্ষণ), (৬) চিকিৎসাস্থান (বিশেষ চিকিৎসা), (৭) কল্পস্থান ও (৮) সিদ্ধি। এই গ্রন্থে অপস্মার প্রভৃতি নানাপ্রকার বাতুলতা এবং মহামারীর কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা আছে। পতঞ্জলি চরকসংহিতার ভাষ্য (ব্যাখ্যা) রচনা করেন। গল্প আছে যে, চরক কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। তাই অধ্যাপক লেভির মতে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লোক।

সুশ্রুত সংহিতা—সুশ্রুতও ছিলেন সুবিখ্যাত চিকিৎসক। মহাভারতে তাঁকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতকে তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়। একাদশ শতকে চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুত সংহিতার টীকা রচনা করেন। জৈঘাট, গয়াদাস ও ডল্লনের ভাষ্য বা টীকাও প্রসিদ্ধ। সুশ্রুতের মতে কেবল রোগনিরাময় নয়, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও ঔষধের প্রয়োজন আছে। বলা হয় যে, সুশ্রুত ছিলেন ধন্বন্তরীর শিষ্য। ধন্বন্তরীর শিষ্যরূপে পরিচিত গার্গ্য ও গালব ছিলেন পাণিনির পূর্ববর্তী। তাহলে সুশ্রুত বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী বলে মনে হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক নাগার্জুন প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতার সংস্কার সাধন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

রসরত্নাকর—গ্রন্থটি নাগার্জুনের রচনা। তিনি আয়ুর্বেদে রসায়নের অর্থাৎ ধাতব ঔষধের প্রবর্তক। তিনি প্রথম কজ্জলী অর্থাৎ পারদের কালো সালফাইড যৌগ ঔষধরূপে প্রবর্তন করেন। গ্রন্থটিতে পারদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি অংশ আছে। চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থে উদ্ভিজ্জ ঔষধেরই প্রাধান্য ছিল। ঔষধরূপে পারদ ছাড়া অন্যান্য দু-একটি ধাতবদ্রব্যের ব্যবহারের কথাও রসরত্নাকরে আছে।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা—গ্রন্থটির রচয়িতা বাগভট্ট চরক ও সুশ্রুতের পরেই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে বেশী প্রচলিত। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং গ্রন্থ দুটির উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয়, বাগভট্ট খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা তাঁর দ্বিতীয় ও পূর্ণপরিণত গ্রন্থ। এতে তিনি চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার সার সংকলন করেছেন। বাগভট্টের রসায়ন সম্পর্কিত রসার্ণব, রসহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয় নামে আরো তিনটি গ্রন্থ ছিল।

এগুলি ছাড়া ভেল ও হারীতের আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ছিল বলে জানা যায়। ইন্দুকরের পুত্র মাধবকরের 'রুগ্‌বিনিশ্চয়', চক্রপাণি দত্তের 'চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ' এবং ষোড়শ শতকের ভাবমিশ্র রচিত ভাবপ্রকাশ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রাচীন ভারতে হস্তী, অশ্বাদি বিভিন্ন পশুর ও বৃক্ষলতাদির চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। নারায়ণ-রচিত মাতঙ্গলীলা, পালকাপ্য-রচিত গজবৈদ্য, বাগভট্টের অশ্বায়ুর্বেদ, নকুল-রচিত অশ্বচিকিৎসা, সুরপাল-রচিত বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner